স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প

গোবিন্দ মন্ডল

ছোটগল্পকে যদি ছোটপ্রাণের দুঃখগাথা হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই, তবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প সম্পর্কে সেকথাই বলা যায়। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে একটু অন্যস্বাদের ছোটগল্প স্বপ্নময়ের। আধুনিক নাগরিক মনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অপেক্ষা সেখানে বেশি করে চোখে পড়ে গ্রাম্য মহাজনি কূটচক্রান্ত, দরিদ্র শ্রমিক বা সমপর্যায়ের মানুষদের দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি — অস্তিত্বের সংকট। গল্পের পটভূমি হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উঠে এসেছে শহর - নগর ছাড়িয়ে গ্রাম্য প্রত্যন্ত পরিবেশ। আর শহরের পটভূমিকায় যদি কোন গল্প গড়ে ওঠে তা সে গল্পও সুসজ্জিত কোন গৃহাভ্যন্তরের গল্প নয়, সে গল্পের প্রধান চরিত্র অন্তেবাসী মানুষজনই। এবং যে পটভূমিতেই গল্প লেখা হোক না কেন, সাদা-কালো ভেদের মতো সে গল্পগুলোতে ধনী - নির্ধন, শোষক - শোষিতের স্পষ্ট ভেদরেখা বর্তমান। যেখানে কখনো সেটেলমেন্ট অফিসারকে ঘুষ দিয়ে দরিদ্র মানুষদের জমি অধিগ্রহণের মহাজনি চক্রান্তের কথা উঠে এসেছে কিংবা উঠে এসেছে স্থায়ী চাকুরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেওয়ার কথা। আবার সেখানে দেখতে পাই ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত গ্রাম কিভাবে নগর জীবনের ছোঁয়ায় দ্রুত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই দেখানোর মধ্য দিয়ে স্বপ্নময়ের কোন রোমান্টিক দৃষ্টির পরিচয় ধরা পড়ে না। বরং নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন গ্রামে শহর কিভাবে ধীরে ধীরে কলোনি গড়ে তুলেছে। এই কলোনাইজেশান, শোষণ গ্রাম শহর সর্বত্র বিদ্যমান। যেমন 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' গল্পে শহরের বহু ডিগ্রিধারী লেডি ডাক্তার মফস্বলের মানুষদের কম পয়সায় চিকিৎসা করার নামে ডাক্তারখানা খোলে। আবার এখান থেকেই শস্তায় কাজের লোক নিয়ে যায় শহরে। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র পরাণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি — "পরাণ ওর জীবনে এই সারবস্তু বুঝে গেছে যে দুনিয়ার সব জায়গায় সব জিনিস সমান ভাবে পাওয়া যায় না। যেখানে যা সস্তা সেটা দামি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার নাম কারবার। ..... ব্যাপারিরা তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় ঐ সব। তাহলে তা লাভ হয়। লাভ হলে - তবে হয় লাভের কারবার।" সমাজের সর্বত্রই চলছে এই লাভের বেসাতি। উল্লেখ করা যায় 'রক্ত' গল্পের কথা। পেটের দায়ে কিছু মানুষ রক্ত বিক্রি করে নামমাত্র মূল্যে। আর সেই রক্ত নিয়ে চলে মহাজনি কারবার। এই গল্পের চরিত্র পাঁচু-র তাই মনে হয় — "সবই মহাজনের হাতের কেরামতি। সকল বস্তু। লাইলন শাড়ি বল, পাইলট পেন বল। উত্তমকুমার বল, সুচিত্রা সেন বল। শালা পাঁঠাটা, ঘাস খায়, তরকারির খোসা খায়, যেই না আইনুলের হাতে পড়ল, ওমনি নাড়ীভুড়ি, ছাল, চামড়া সবকিছুর মূল্য হয়ে গেল। শরীলডার মধ্যি রক্তগুলান আছে, চুপচাপ আছে, দাম নি, স্যাখনি মহাজনের হাতে পড়ল ....."। তখনই তা হয়ে ওঠে মহার্ঘ। স্বপ্নময়ের গল্প পড়তে পড়তে এসব কিছু আমাদেরকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়, আমাদেরকে ভাবায়।

তবে ছোটগল্প লিখতে গেলে 'ছোট প্রাণ ছোট কথা'-র আদর্শ দিয়ে কি আজ আর কাজ হবে? — এমন প্রশ্ন তোলেন আধুনিক সমালোচক আখতারুজ্জমান ইলিয়াস। "ছোট প্রাণ, ছোট কথা' বলে তখন কিছু আছে কি? 'ছোট দুঃখ' কোনটি? প্রতিটি ছোট দুঃখের ভেতর চোখ দিলে দেখা যায় তার মস্ত প্রেক্ষাপট, তার জটিল চেহারা এবং তার কুটিল উৎস।" এসবই তুলে ধরতে হবে ছোটগল্পে। তা করতে গিয়ে ছোটগল্পের গঠনেরও করতে হবে পরিবর্তন। ইলিয়াসের মতে "একটি সাহায্য-সংস্থার রিপোর্টের অংশ। খবরের কাগজের ভাষা ..... বিজ্ঞাপনের একটি লাইন তুলে দিতে পারেন।" লেখক আধুনিক এই সংকটের বহুবিচিত্র মাত্রাকে ধরতে। বলা বাহুল্য স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে ইলিয়াস কথিত আদর্শের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর গল্প যেন অসংখ্য টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ দিয়ে নির্মিত। প্রয়োজনে কখনো তিনি তুলে ধরেন ডায়ারির কয়েকটি পাতা। যা আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হলেও বৃহত্তর অর্থে তা হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ।

কথাসাহিত্যিকের কাছে ঈপ্সিত যে সমাজ বাস্তবতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে না। তাঁর গল্পে সমাজ ও জীবনের স্থিরচিত্র নয়, জীবনস্পন্দনও অনুভব করা যায়। গ্রাম বিষয়ে একটা ঔদাসিন্য আমাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতিবিদ্ধ লেখকের মতো স্বপ্নময়ের লেখায় উঠে আসে সজীব গ্রাম্য জীবনচিত্র। এর পাশাপাশি গ্রাম বিষয়ে নাগরিক মানুষের ন্যাকামিপনা ও বামপন্থী কর্মীর দুর্বল আদর্শবাদ কয়েকটি রেখাচিত্রে তুলে ধরেন তিনি। যেমন ধরা যাক 'ভালো করে পড়গা ইশ্‌কুলে' গল্পের কথা। যেখানে কথকের বন্ধু নাগরিক, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন, প্রগতিশীল পত্রিকায় লেখালেখি করেন। গ্রামে বেড়াতে এসে তিনি কথকের দুই ছাত্রকে দেখিয়ে মেয়েকে বলেন — "দেখছ তো টুম্পা, আমাদের দেশের মানুষেরা কত গরিব, ছেলে দুটো তোমারই বয়সী, অথচ দ্যাখো, তুমি ছবি আঁকছ আর ওরা পয়সা রোজগারের জন্য এখনই কীরকম ইয়ে করছে।" সঙ্গে সঙ্গে "বন্ধুপত্নী একটু কপাল কুঁচকাল।" তারপর বলে — 'সবজায়গায় কম্‌রেডি কি ভালো?' কথকের বন্ধুর ইচ্ছা ছিল তাঁর মেয়ে 'সাধারণ মানুষের দুঃখবোধ নিয়ে ও বড়ো হবে।' কিন্তু তাঁর 'স্ত্রীর ইচ্ছেতেই টুম্পা এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে।' এই ঠুনকো বিলাসিতা যেমন স্ত্রীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তেমনি বাধা না পেয়েও বাস্তবে একে রূপায়িত করতে পারেন না তিনি। দরিদ্র দুই রাখাল বালককে শতরঞ্জিতে বসতে বলে যখন আত্মসুখে নিমগ্ন হন তিনি তখন বীরভূম থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়ায় তাদের একজনের গামছাটা একটু সরে যেতেই 'হাঁটুর উপর ঘোস-পাঁচড়ার ঘা বের হয়ে পড়ল।' বন্ধুটি ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কথককে বললো — 'দেখ ইশ্ - পায়ে কী সব ইয়ে - শতরঞ্জি থেকে সরে বসতে বল।'— বাস্তবের দমকা হাওয়ায় এভাবে ধনীর দারিদ্র্য বিলাসিতা মিলিয়ে যায়। এই চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি নিম্নবিত্ত মানুষদের দুঃসহ জীবিকা নির্বাহ প্রচেষ্টা, জীবন যন্ত্রণা, নিজস্ব সংস্কৃতি - বিশ্বাস, গ্রাম্য দলাদলি, প্রবাদ প্রবচন সহ তাদের কথা বলার ভঙ্গী, 'অশালীন' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সাবলীল কথাবার্তা, — ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বপ্নময় জীবন্ত চরিত্রকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পগুলিতে।

লেখকের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সেখান থেকে স্বপ্নময় দেখিয়েছেন — গ্রাম্য সামন্ততন্ত্র শাসিত সমাজ বা শহরের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা — যাই হোক না কেন, শোষণই সব সমাজের মূল কথা। এখানে

থেমে থাকেনি লেখক। এই ব্যাধির উৎস নির্ণয়েও তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সামাজিক কোন সমস্যা আজ আর সরল কোন সমস্যা নয়, নানান জটিল কুটিল চোরাস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে তা আচ্ছন্ন। তাই লেখককেও একটি কারণের উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে আপাতভাবে সম্পর্কহীন অন্যান্য সমস্যার প্রকৃতি - উৎস নির্ণয়ে প্রয়াসী হতে হয়েছে। হয়তো সেখানে পথের সন্ধান করেছেন তিনি — শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব — এই মতাদর্শের পথ ধরে। চেতনা-বিপ্লব আজও সুদূর পরাহত, কারণ প্রকৃত শিক্ষা থেকে আজও সমাজ বঞ্চিত। তাই লেখককে প্রথমেই করতে হয়েছে এই সমস্যার সুলুক সন্ধান। 'ভালো করে পড়গা ইশ্‌কুলে' গল্পটি ধরে বিষয়টা আলোচনার অগ্রসর হতে পারি। — অজয় নদের তীরে প্রত্যন্ত এক গ্রাম। কথক সেখানকার এক স্কুলের শিক্ষক। বয়স্ক ও শিশু শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। যেখানে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কথক তাঁর দু'জন ছাত্রের কাছে জানতে পারেন — 'এখুনে যে গাট্টি কচুর জো সার, এখুন ইস্কুলে গিলে বাবা ঠেঙ্গান দিবে সার।'— দারিদ্র্য। আসলে এই সব দরিদ্র পরিবারে শিক্ষা প্রচেষ্টা নিছক বিলাসিতা মাত্র। তাই গণেশের বাবা গণেশকে স্কুল থেকে ধরে নিয়ে যায় কাজের জন্য এবং ছেলের পড়াশুনা শেখার এই আগ্রহের জন্য শিক্ষকের সামনে যেভাবে গালিগালাজ করে তা সভ্যসমাজে হয়তো অশালীন বোধ হবে — 'শুয়ারের পো, বাবু হবার শক পোঁদে টুইক্যে দিব। হাত থেকে শ্লেট কেড়ে নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিল। রোজ রোজ বইলছি মাঠ থে ধানগুলো বাবুবাড়ি পৌঁছে দে আয়, — আমি এই গুষ্টি গিলুব, — আর বেট্টা বাবু হঁনছে — অ্যাঁড় ছিনছে দুব।'— পারিবারিক দারিদ্র্য আমাদের শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি শিশু শিক্ষার্থীর মনযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ। বাস্তবের সঙ্গে এর এতই ব্যবধান যে, পাঠ্য বইয়ের বাইরে এদের খুঁজতে গেলে হতে হয় নিরাশ। আলোচ্য গল্পে 'ঐ দেখ মা বর্ষা হল ঘনঘটায় ঘিরে/বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে আকাশ চিরে চিরে/ দেকতা যখন ডেকে ওঠে থরথরিয়ে কেঁপে/ভয় করতেই ভালোবাসি তোমার বুকে চেপে'— রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি পড়ার পর যখন প্রশ্ন হল - 'বিষ্টি পড়লে কী ইচ্ছে করে?' উত্তর - 'মাছ নাপিয়ে আসে নাবালে, কৈ, শিঙি, পোল্যো দে ধরতে ইচ্ছে যায়, একজন বলল, বিষ্টি পড়লে খড়ের ঘরে জল পড়ে, ভালো লাগে না তকুন, অন্য একজন বলল।' প্রশ্ন - 'মায়ের কোলে বসে থাকতে ভালো লাগে না?' উত্তর - 'মা তৈড়ে দেয় মাস্টার, মা বলে জল হইয়েছে, গেঁড়ি-গুগলি খুঁজ্যে নে আয়।'— কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে এই অসঙ্গতি হাস্যরসের উদ্রেক করলেও বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা যে সম্পর্কশূন্য — এই বার্তা আমাদের বোধের দুয়ারে পৌঁছাত দেরি করে না। যে সম্পর্ক শূন্যতার জন্য শহরের মেয়ে টুম্পা গ্রামে এসে হতাশ হয় কোন রাখাল বালককে গাছতলায় শুয়ে বাঁশি বাজাতে না দেখে। কিংবা ছবিতে দেখা তেমন কৃষক তার নজরে পড়েনি, যেমন পড়েনি পদ্ম সুশোভিত কোন শান্ত পুকুর। অন্যদিকে আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রয়ে গেছে দুস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান যতদিন না দুর হচ্ছে ততদিন শুধু পাঠদানের মাধ্যমে কাউকে বোধগোম্য করানো যাবে না এই সমাজের সমস্যা। লেখাটা তাদের কাছে অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন এই গল্পের চরিত্র অবনী লিখতে পড়তে শিখেছে। কিন্তু আধুনিক সভ্য নগর জীবনের সমস্যা-কথায় ভরা সংবাদপত্রের কোন অর্থ বোধগম্য হয়না তার। তাই এসব পড়তে তার ভালো লাগে না। — এমনই যদি হয় আমাদের শিক্ষার হাল তবে চেতনা আর বিপ্লব এই শিক্ষা ব্যবস্থার বইয়ের লেখার মতই হয়ে থাকবে অধরা মাধুর; বাস্তবায়িত হবে না তা কখনোই।

তাই বিপ্লব ঘনীভূত হয়ে ওঠে না এখানে। শোষণকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে শোষকের দয়ায় বেঁচে থাকাকে এরা জীবনধারণ বলে। যেমন 'ঢোঁড়া উপাখ্যান'- এ বংকা। তার মেয়ে কুসুমকে ভিটে থেকে উৎখাত করতে বাবুরা তাকে তেলের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করে। একথা বংকা জানে। অথচ সে তারপরেও বাবুদের খাস চাকর রয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল — 'কুসুমের কি হয়েছিল জানো?'

'— মরণ হইছিল। মরণ। বলাই ডেকেছিল। গরীবের ঢ্যামনামী হইছিল। বেগুন পোড়া তেল কে মেখে খাবার শখ হইছিল। গরীবের ঐ শখ হয় কেন?

— তারপর?

— আর জানিনা। গুরুর মানা। না জেনে বলতে নাই।'— নির্বাক রয়ে যায় তাদের প্রতিবাদ। কোন প্রতিবাদী গল্পের চেতাবাণীও তাদের উজ্জীবিত করতে পারে না। যে গল্প শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায় 'পাক্কা কম্যুনিস্ট,' 'গল্পমশাই' বলে তারিফ করে সেই গল্পের বিপ্লবী নায়কের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উত্তর যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হল — 'কালে পেয়েছিল, কপালে নেকা ছিল, তাই মরল।' তবু শোষণে জর্জরিত হয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে কখনো হৃদয়। তাই 'গণশার ইচ্ছে ও লেখাপড়া শিখে দারোগা হবে। যে - বাবুবাড়ি মাথায় করে ধান বয়ে নিয়ে যেতে হয়, যে - বাড়ির গরু চরাতে হয়, যে - বাবুকে তেল মালিশ করে দেয় মা শীতের দিনে, দারোগা হয়ে সে বাবুকে একদিন গুলি মেরে দেবে।' কিন্তু এ স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়; বাস্তবায়িত হয় না। 'গণশার বাবা মরেছে। গণ্‌শা দুর্গাপুরের চায়ের দোকানে কাজে লেগেছে।'— কোন স্বপ্নপূরণের গল্প নয়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা হয়ে ওঠে সমাজবাস্তবতার গল্প।

যখন বিদ্রোহ ঘনায় না দিকে দিকে। এইসব ম্লান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা - এসব কথাও যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখন স্বপ্নময়ের লেখায় দেখা যায় এক অনুশোচনার আত্মগ্লানি। 'রত্নাকরের পাপের ভাগ' গল্পে তাই দেখি কথকের বউদির বাবার অতুল ঐশ্বর্যের উৎস জানার পর কথকের মধ্যে দেখা গেছে এমনই এক আত্মগ্লানি। কথকের বউদির বাবা যে উপহার সামগ্রী দিয়েছে, যার সমস্ত বিলাসিতা সে ভোগ করেছে, তা তো পাপের পয়সায়। দস্যু রত্নাকরের পিতা তার পাপের কোন ভাগ নেননি। কথকের পিতাও এই দস্যু বৃত্তির পাপের ভাগ নেননি। কথকও কি নেবেন এই ভাগ? 'আমিও ভদ্র সন্তান।..... সুতরাং .....।' কিংবা 'কাননে কুসুমকলি' গল্পে ডকুমেন্টারি ফিল্মে দরিদ্র শিশুশ্রমিকের আঙুল কেটে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে ফেলার জন্য ঘরে বাইরে সবাই যখন দেবাশিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় তখন সে ভয়ে, আত্মগ্লানিতে কুঁকড়ে যেতে থাকে। এই নৃশংস দৃশ্য নিয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি মানবিকতার মুখ আমরা দেখতে পাই দেবাশিসের মধ্যে। তাই দিল্লি থেকে বেস্ট ডকুমেন্টারি ফিল্মের জন্য যে এ্যাওয়ার্ড পায় সেটা ঐ ক্ষতিগ্রস্ত শিশু শ্রমিকটির হাতে তুলে দিতে চায় সে। সমাজের নিষ্ঠুর অমানিশার মাঝে এই মানবিক মুখ আমাদের কাছে গভীর আবেদন রাখে। সবকিছু ছাড়িয়ে স্বপ্নময়ের গল্প হয়ে ওঠে মানবিকতার দরদে ভরা লেখা।